কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

৪০০০ স্কুল প্রায় পরিত্যক্ত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্কুলটা নামেই সরকারি। শিক্ষকদের শুধু বেতন দেয় সরকার। এর বাইরে এক পয়সারও অবদান নেই তাদের। এভাবে পড়ালেখা হয়? আমরা চাঁদা তুলে শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছি।' শুধু টেংরা আর রাখালগাছি বিদ্যালয় নয়, সারা দেশে এমন জীর্ণশীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা ৯ হাজার বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এসব নড়বড়ে প্রতিষ্ঠানেই চলছে শিক্ষার প্রাথমিক ভিত গড়ার কাজ। এ তো গেল অবকাঠামোগত পরিস্থিতি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে চরম শিক্ষক সংকট।' দুইয়ে মিলে দেশের আগামী প্রজন্মের প্রাথমিক শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বলে অভিমত শিক্ষাবিদদের।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের উপপরিচালক হুমায়ন কবির কালের কণ্ঠকে বলেন, '৯ হাজার বিদ্যালয়ের ভবন জরুরি ভিত্তিতে তৈরির জন্য আমরা তালিকা বানিয়েছি। অর্থ বরাদ্দ পেলেই কাজ শুরু হবে। ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে যেসব বিদ্যালয়ের কথা আপনারা বলছেন, সেগুলো এই তালিকায় আছে।'

২০১২ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ হাজার। ২০১৩ থেকে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো ২৬ হাজার। সাত বছর ধরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। ফলে পুরনো সেই ৩৬ হাজার বিদ্যালয়ের ১৫ হাজারেই নেই প্রধান শিক্ষক। বেশির ভাগ স্কুলেই শিক্ষক সংখ্যা চারজন। প্রধান শিক্ষক না থাকলে বাকি তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যস্ত থাকতে হয় প্রশাসনিক এবং সরকারি ও স্থানীয় নানা কাজে। ফলে দুজনকেই মূলত চালাতে হয় ক্লাস। একটি স্কুলে প্রাক-প্রাথমিকের ক্লাসের সময় আড়াই ঘণ্টা। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে চারটি ক্লাস এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৪৫ মিনিটের ছয়টি ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু দুজন শিক্ষকের পক্ষে এত ক্লাস নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কোনো রকমে এসব স্কুলে সিলেবাস শেষ করানো হলেও শিশুরা আসলে কতটুকু শিখছে, সে প্রশ্ন শিক্ষাবিদদের।

বগুড়া জেলার কুড়াহারহাট সূর্যতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক মাত্র তিনজন। তাঁদের মধ্যে আবদুল হান্নান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'খুবই সমস্যা হচ্ছে। ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া যাচ্ছে না। আমাকে বেশির ভাগ সময় সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। আবার একজন শিক্ষক অনেক সময় ছুটিতেও থাকেন। প্রাক-প্রাথমিকে আড়াই ঘণ্টার ক্লাস এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রতিদিন চারটি আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ছয়টি ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতায় একজনকেই একসঙ্গে দুটি ক্লাস চালাতে হচ্ছে। একসঙ্গে একাধিক বিষয় পড়াতে হচ্ছে।'

২০১৩ সালে জাতীয়করণ হওয়া স্কুলগুলোর শিক্ষকদের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদরা। কারণ এসব স্কুলের বেশির ভাগ সহকারী শিক্ষকই এসএসসি পাস আর প্রধান শিক্ষকরা উচ্চ মাধ্যমিক। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা একবার প্রশিক্ষণ পেলেও তাঁদের অনেকেরই তা নেই। অথচ সব স্কুলই এখন একই কাতারে এসেছে। তাই শিক্ষার মান বাড়াতে এসব স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ জরুরি বলে অভিমত শিক্ষাবিদদের।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখনই ইউরোপ-আমেরিকার মতো মান আশা করলে হবে না। আমাদের মতো করেই মান চাইতে হবে। আমাদের প্রাথমিক স্কুলে এখন বিএ-এমএ পাস শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি। তাঁরা যদি তাঁদের পুরো দক্ষতার প্রয়োগ ঘটান, তাহলে শিক্ষার মান আরো বাড়বে। তবে দুর্গম এলাকায় কিছু সমস্যা আছে। সেখানে শিক্ষকরা অতটা মনোযোগী নন। শিক্ষকদের আন্তরিকতারও কিছুটা অভাব রয়েছে। তাঁদের আরো দরদি হতে হবে। আর অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বেতন কাঠামো তুলনা করলে চলবে না। এর পরও আমরা ২০১৩ সালে ২৬ হাজার স্কুল নতুন করে জাতীয়করণ করেছি। বেতনও বেড়েছে। প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে তোলা হয়েছে। শিক্ষকরা এখন যা পাচ্ছেন আগে তো তাও পেতেন না। আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আর মান কখনোই রাতারাতি বাড়ানো সম্ভব নয়।'

জাতীয় শিক্ষানীতিতে খেলা ও আনন্দের ছলে শিশুদের পড়ানোর কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাক-প্রাথমিকের জন্য একটি বই, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে তিনটি এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছয়টি করে বই নির্ধারণ করেছে। অথচ শিশুদের পড়তে হচ্ছে পাঁচ-ছয়গুণেরও বেশি বই। বইয়ের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ছোট্ট সোনামনিরা। বাসায়ও মুক্তি মিলছে না তাদের। স্কুল থেকে দেওয়া হচ্ছে একগাদা হোমওয়ার্ক। তা নিয়েই কেটে যাচ্ছে বিকেল, রাত। পরদিন সকালে আবার স্কুল। স্কুলে গিয়ে একটু খেলাধুলারও উপায় নেই। বেশির ভাগ স্কুলেই নেই খেলার মাঠ। তাই সেখানেও একরকম বন্দিদশা। এভাবেই আনন্দহীন পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নিচ্ছে শিশুরা। বাংলাদেশে শহর এলাকায় কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয় ৬৪.৩ শতাংশ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ১৯.৩ শতাংশ শিশু। বাকিরা অন্যান্য স্কুলে। এর মধ্যে সরকারি স্কুলগুলোতে অবকাঠামোগত কিছু সুবিধা থাকলেও বেসরকারিতে এর ছিটেফোঁটাও নেই। তবে শিক্ষাবিদরা বলছেন, সুযোগ-সুবিধায় এগিয়ে থাকলেও মানের দিক দিয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অভাব রয়েছে উন্নত কারিকুলাম, দক্ষ শিক্ষক, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রশাসনের তদারকিতেও।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অন্যতম পছন্দের চাকরি শিক্ষকতা। এই পেশায় আয় ও সামাজিক মর্যাদা দুটোই বেশি। ভারতেও প্রাথমিকের শিক্ষকদের বেতন ৩০ হাজার টাকার ওপরে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কমিশন আছে। শ্রীলঙ্কায় প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি প্রথম শ্রেণিভুক্ত। মালয়েশিয়ায় শিক্ষকদের অন্যতম মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষকরা চাকরি শুরু করেন মাত্র আট হাজার টাকায়। কিন্ডারগার্টেনগুলোর শিক্ষকদের বেতন দুই-তিন হাজার টাকার বেশি নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকতা পেশায় উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবীরা আসছে না। সরকারি প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা এত দিন ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী। সম্প্রতি তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছেন। তবে সহকারী শিক্ষকরা রয়ে গেছেন তৃতীয় শ্রেণিতেই। এত দিন আমাদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার জন্য মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি ও সমমান। সম্প্রতি তা বাড়িয়ে এইচএসসি করা হয়েছে। মূলত তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে মর্যাদা পাওয়া শিক্ষকরাই আমাদের দুই কোটি ৯১ লাখ শিশুকে পড়ালেখা করাচ্ছেন। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা চাকরির প্রথমদিকে একবার প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেও বেসরকারি শিক্ষকদের তাও নেই।

জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিসিএস দিয়ে ঢোকা সরকারি কর্মকর্তাদের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন এক টাকা হলেও বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু সরকার শিক্ষকদের কেমনভাবে দেখে তা তাদের বেতন কাঠামো দেখলেই বোঝা যায়। তাই প্রাথমিকের শিক্ষকরাও শিক্ষকতাকে তৃতীয় পেশা হিসেবে বিবেচনা করছেন। তাঁদের প্রথম পেশা কৃষি অথবা ব্যবসা। দ্বিতীয় পেশা মাতব্বরি করা। যাঁরা প্রথম পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে নিতে পারেন না, তাঁদের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষা আশা করা যায় না। এর পরও প্রাথমিকে শিক্ষক হিসেবে ঢুকতে হলে তো বেশির ভাগকেই ঘুষ দিতে হয়। তাহলে কিভাবে তাঁরা শিশুদের নৈতিকতার শিক্ষা দেবেন?'

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকলেও ফলাফলের দিক দিয়ে তারা পিছিয়ে পড়ছে। গত বছরের পিএসসি পরীক্ষায় দেখা যায়, পিটিআই-সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় সবচেয়ে ভালো করেছে। তাদের পাসের হার সর্বোচ্চ ৯৯.৬২ শতাংশ। ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয়ে ৯৯.৫৬ শতাংশ, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৮.৮৫ শতাংশ, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৯.১৫ শতাংশ ও কিন্ডারগার্টেন ৯৯.১৩ শতাংশ। এরপরই অবস্থান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৮.৩০ শতাংশ। অথচ বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীই সরকারি স্কুলের। এমনকি সেরা ২০ বিদ্যালয়ের মধ্যেও ঠাঁই পেয়েছে মাত্র একটি সরকারি স্কুল। ২০১৪ সালে শূন্য পাস করা ১৩৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশির ভাগই সরকারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মান নিয়ে সরকার যে কথা বলছে সেটা নিম্নমানের। এত দিন প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির। এখন দ্বিতীয় শ্রেণির হয়েছেন। সরকার তাঁদের প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করার সাহস দেখাতে পারেনি। শিক্ষকরা প্রথম শ্রেণি না পেলে মেধাবীরা কেন সেখানে যাবে। শুধু বই তুলে দিলে হবে না; স্কুলে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি নেই। শিক্ষকদেরও যে প্রস্তুতি থাকা দরকার, তা নেই। আর শিক্ষায় আমাদের বিনিয়োগও বাড়াতে হবে।'

এ ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা এখনো তেমনভাবে শুরুই করতে পারেনি সরকার। পঞ্চম শ্রেণিতে পরীক্ষার বিষয়টি না থাকলেও ঘটা করে নেওয়া হচ্ছে পিএসসি পরীক্ষা। এতে পরীক্ষাভীতিও কাজ করছে শিশুমনে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার বিষয়টিও ঝুলে আছে। গ্রামের শিশুদের বেশির ভাগই দরিদ্র। স্কুলে এই শিশুরা দুপুরে খাওয়ার কিছু পায় না। ফলে পড়ালেখায়ও তাদের মন বসে না। এ জন্য দুপুরে খাবার প্রদানের একটা কর্মসূচি চালুর কথা থাকলেও তা তেমন এগোয়নি। এখন দুটি কর্মসূচির অধীনে ৬২ হাজার বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র দুই হাজার ৬০০টিতে চার পিস করে বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। এই বিস্কুটের মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। এরপর আবার চলতি বছরের ডিসেম্বরেই একটি কর্মসূচি শেষ হয়ে যাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করে গণস্বাক্ষরতা অভিযান। এই সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. মোস্তাফিজুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মান নির্ভর করে গুণগত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের ওপর। আমাদের বেশি অভাব শিক্ষকের মানে। তাঁরা কমিটেডও নন। আগে শিক্ষকরা শিক্ষকতাকে গুরুদায়িত্ব হিসেবে নিতেন। এখন চাকরি হিসেবে নিয়েছেন। সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। প্রাথমিকে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার সময় এসেছে। আর আমাদের কিন্ডারগার্টেনের অবস্থা বেশি ভয়াবহ। তাদের কেউ মনিটরিং করে না। অথচ দিন দিন সেখানে শিক্ষার্থী বাড়ছে। সরকারি প্রাথমিকে একবার হলেও প্রশিক্ষণের সুযোগ পান শিক্ষকরা, কিন্তু কিন্ডারগার্টেনে তাও নেই। তাই শিশুদের বড় একটি অংশকে বাইরে রেখে সরকারি প্রাথমিকে সুযোগ বাড়ালে গড় মানের উন্নতি হবে না।